



সূরা আল-ফাতহ

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত ২৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালব আল্লাহর নামে।

(১) নিচয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট (২) যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত কৃটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (৩) এবং আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য। (৪) তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রজ্ঞাময়। (৫) ঈমান এজন্যে বেড়ে যায়, যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে জন্মতে প্রবেশ করান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেখায় তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং যাতে তিনি তাদের পাপ মোচন করেন। এটাই আল্লাহর কাছে মহাসাফল্য। (৬) এবং যাতে তিনি কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারী এবং অশ্লীলাদি পুরুষ ও অশ্লীলাদিনী নারীদেরকে শাস্তি দেন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা সোষণ করে। তাদের জন্য মন্দ পরিণাম। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন। এবং তাহাদের জন্যে জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল অত্যন্ত মন্দ। (৭) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৮) আমি আপনাকে ধারণ করেছি অবস্থা ব্যক্তকারীরূপে, সুস্ববাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে, (৯) যাতে তোমরা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর।

সূরা আল-ফাতহ

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে সূরা ফাতহ স্বর্গ হিজরীতে অবতীর্ণ হয়, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেলামকে সাথে নিয়ে মক্কা মোকাররমা তশরীফ নিয়ে যান এবং হেরেমের সন্নিহিতে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন। মক্কার কাফেররা তাঁকে মক্কা প্রবেশে বাধা দান করে। অতঃপর তারা এই শর্তে সন্ধি করতে সম্মত হয় যে, এ বছর তিনি মদীনায় ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর এই ওমরার কায্য করবেন। সাহাবায়ে কেলামের মধ্যে অনেকেই বিশেষতঃ হযরত ওমর (রাঃ) এ ধরনের সন্ধি করতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) খোদায়ী ইঙ্গিতে এই সন্ধিকে পরিণামে মুসলমানদের জন্যে সাফল্যের উপায় মনে করে গ্রহণ করে নেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ওমরার এহরাম খুলে হুদায়বিয়া থেকে ফেরত রওযানা হলেন, তখন পশ্চিমধ্যে এই পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) —এর স্বপ্ন সত্য এবং অবশ্যই বাস্তবরূপ লাভ করবে। কিন্তু তার সময় এখনও হয়নি। পরে মক্কা বিজয়ের সময় এই স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করে। এই সন্ধি প্রকৃতপক্ষে মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছিল। তাই একে “প্রকাশ্য বিজয়” বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ ও অপর কয়েকজন সাহাবী বলেন : তোমরা মক্কা বিজয়কে বিজয় বলে থাক; কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বিজয় মনে করি। হযরত জাবের বলেন : আমি হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বিজয় মনে করি। হযরত বারা ইবনে আযেব বলেন : তোমরা মক্কা বিজয়কেই বিজয় মনে কর এবং নিঃসন্দেহে তা বিজয় ; কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার ঘটনায় ‘বয়্যাত-রিখওয়ান’ কেই আসল বিজয় মনে করি। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি বৃক্ষের নীচে উপস্থিত চৌদ্দশত সাহাবীর কাছ থেকে জেহাদের শপথ নিয়েছিলেন। এ সূরায় বরাতে আলোচনাও করা হয়েছে। (ইবনে কাশীর)

হুদায়বিয়া : হুদায়বিয়া মক্কার বাইরে হেরেমের সীমানার সন্নিহিতে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। আজকাল এই স্থানটিকে “শমীসা” বলা হয়। ঘটনাটি এই স্থানেই ঘটে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) —এর স্বপ্ন : আবদ ইবনে হুমায়দ, ইবনে জরীর, বায়হাকী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনার এক অংশ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় স্বপ্ন দেখলেন তিনি সাহাবায়ে কেলামসহ মক্কায় নির্ভয়ে ও নির্বিশ্বে প্রবেশ করছেন এবং এহরামের কাছ সমাপ্ত করে কেউ কেউ নিয়মানুযায়ী মাথা মুগুন করেছেন, কেউ কেউ চুল কাটিয়েছেন এবং তিনি বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছেন ও বায়তুল্লাহর চাবি তাঁর হস্তগত হয়েছে। এটা সূরায় বর্ণিত ঘটনার একটা অংশ। পয়গম্বরগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তাই স্বপ্নটি যে বাস্তবরূপ লাভ করবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এই ঘটনার কোন সন, তারিখ বা মাস নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নটি মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিফলিত হওয়ার ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সাহাবায়ে কেলামকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনালেন, তখন তাঁরা সবাই পরম আগ্রহের সাথে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সাহাবায়ে কেলামের প্রস্তুতি দেখে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—ও ইচ্ছা করে ফেললেন। কেননা, স্বপ্নে কোন বিশেষ সাল অথবা মাস নির্দিষ্ট ছিল না। কাজেই এই মুহূর্তেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। — (বয়ানুল কোরআন)

সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ও আনুগত্যের আরও একটি পরীক্ষা : পূর্বেই বলা হয়েছে, সন্ধির শর্তাবলী এবং ওমরা ব্যতিরেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে দুঃসহ ছিল। অনন্য সাধারণ ঈমানের বলেই তাঁরা এসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে রসূলের (সাঃ) আনুগত্যে অটল ও অনড় থাকতে পেরেছিলেন। হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) - 'কুরা গামীম' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন আলোচ্য 'সূরা ফাতহ' অবতীর্ণ হয়। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সূরাটি পাঠ করে শুনালেন। তাদের অন্তর পূর্বেই আহত ছিল। এমতাবস্থায় সূরায় একে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দেয়ায় হযরত ওমর (রাঃ) আবার প্রশ্ন করে বসলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ ! এটা কি বিজয় ? তিনি বললেন : যার হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার কসম, এটা প্রকাশ্য বিজয়। এই ভাষ্যের সামনেও সাহাবায়ে কেরাম মাথা নত করে নিলেন এবং গোটা পরিস্থিতিকে প্রকাশ্য বিজয় মেনে নিলেন।

হুদায়বিয়া সন্ধির ফলাফল ও কল্যাণের বিকাশ : এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া এই প্রকাশ পায় যে, কোরাইশ ও তাদের অনেক অনুসারীদের সামনে তাদের অন্যায় জেদ ও হঠকারিতা ফুটে উঠে এবং তাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকা এবং ওরওয়া ইবনে মসউদ আপন আপন দল নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ সাহাবায়ে কেরামের নজীরবিহীন আত্মনিবেদন ও রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর প্রতি তাদের অনুপম অনুরাগ, সম্ভ্রম ও আনুগত্য দেখে কোরাইশরা ভীত হয়ে যায় এবং সন্ধি করতে সম্মত হয়। অথচ তাদের জন্যে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার এই চাইতে উত্তম সুযোগ আর ছিল না। কেননা, তারা নিজেদের বাড়ী-ঘরে ছিল এবং মুসলমানগণ ছিলেন প্রবাসী। পানির জায়গাগুলো তাদের অধিকারে ছিল। মুসলমানগণ ছিলেন ঘাস পানিবিহীন প্রান্তরে। তাদের পূর্ণ রণশক্তি ছিল। মুসলমানদের কাছে তেমন অশস্ত্র-শস্ত্রও ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। তাদের দলের অনেক লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর সাথে সাক্ষাত ও মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে অনেকের অন্তরে ইসলাম ও ঈমান আসন করে নেয় এবং তারা মুসলমান হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের কারণে পথঘাট নিরাপদ হয়ে যায় এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সকল বাধা অপসারিত হয়। আরব গোত্রসমূহের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম আরবের কোণে কোণে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেন। বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর নামে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন বড় বড় বাদশাহ ইসলাম গ্রহণ করেন। এসব কার্যক্রমের ফল এই দাঁড়ায় যে, হুদায়বিয়ার ঘটনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর ব্যাপক দাওয়াত ও ওমরার জন্যে বের হওয়ার তাকীদ সত্ত্বেও যেখানে দেড় হাজারের বেশী মুসলমান সঙ্গে ছিল না, সেখানে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এই সময়েই সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজিত হয়, যার ফলে বিপুল পরিমাণে সমরোপকরণ হস্তগত হয় এবং মুসলমানদের সমরশক্তি সুসংহত হয়। সন্ধির পর দুই বছর অতিক্রান্ত না হতেই মুসলমানদের সংখ্যা এত বেড়ে যায়, যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এরই ফলস্বরূপ কোরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গের দরুন যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) গোপনে মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করেন, তখন সন্ধির মাত্র বিশ একুশ মাস পরে তাঁর সাথে মক্কাগমনকারী আত্মনিবেদিত মুসলমান সিপাহীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সংবাদ পেয়ে কোরাইশরা উদ্ভিগ্ন হয়ে চুক্তি নবায়নের জন্যে

তড়িঘড়ি আবু সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) চুক্তি নবায়ন করলেন না এবং অবশেষে দশ হাজারের খোদায়ী লশকর সাথে নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। কোরাইশরা এত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, মক্কায় তেমন কোন যুদ্ধের প্রয়োজনই হয়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর দূরদর্শী রাজনীতিও কিছুটা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে সহায়তা করেছিল। তিনি মক্কায় ঘোষণা করে দেন যে, যে ব্যক্তি গৃহের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। এভাবে সব মানুষ নিজ নিজ চিন্তায় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধের তেমন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। এ কারণেই মক্কা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না যুদ্ধের মাধ্যমে - এ বিষয়ে ফেকাহশাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যৌকথা, অতি সহজেই মক্কা বিজিত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর স্বপ্ন বাস্তব ঘটনা হয়ে দেখা দেয়। সাহাবায়ে কেরাম নিশ্চিন্তে বায়তুল্লাহর তওয়াফ, মাথা মুণ্ডানো ও চুল কাটেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদেরকে নিয়ে বায়তুল্লায় প্রবেশ করেন। বায়তুল্লাহর চাবি তাঁর হস্তগত হয়। এ সময় তিনি বিশেষভাবে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে এবং সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে সম্বোধন করে বলেন : এই ঘটনাই আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। এরপর বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওমরকে (রাঃ) বলেন : এই ঘটনাই আমি তোমাকে বলেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন : নিঃসন্দেহে কোন বিজয় হুদায়বিয়ার সন্ধির চাইতে উত্তম ও মহান নয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তো পূর্ব থেকেই একথা বলতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের চিন্তা ও অস্বদৃষ্টি আল্লাহ ও রসূলের (সাঃ) মধ্যকার এই মীমাংসিত সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তারা স্বপ্নের দ্রুত বাস্তবায়ন কামনা করত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বাস্দের দ্রুততা দূরা প্রভাবান্বিত হয়ে দ্রুততা অবলম্বন করেন না, বরং তাঁর প্রত্যেক কাজ যথার্থ সময়েই সম্পন্ন হয়। তাই 'সূরা ফাতহে' আল্লাহ তাআলা হুদায়বিয়ার ঘটনাকে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির এসব গুরুত্বপূর্ণ অংশ জানার পর পরবর্তী আয়াতসমূহ বোঝা সহজ হবে। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

يَوْمَئِذٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِمْ إِذِ انبأَهُمْ آلُؤُتَيْمُودُ مِنْ دُونِهَا أَنْ مُتَّعْتُم مَاءً غَيْرَ غَالِبٍ

এখানে প্রথমোক্ত ৩ লম্বে কারণ বর্ণনার জন্যে ধরা হলে এর সারমর্ম এই হবে যে, আয়াতে বর্ণিত তিনটি অবস্থা অর্জিত হওয়ার জন্যে আপনাকে প্রকাশ্য বিজয়দান করা হয়েছে। তিনটি অবস্থা এই : (এক) আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ গোনাহ মাফ করা। সূরা মুহাম্মদে প্রথমে বর্ণিত হয়েছে যে, পয়গম্বরগণ গোনাহ থেকে পবিত্র। তাঁদের বেলায় কোরআনে যেখানে সেখানে ذنب অথবা عصيان (গোনাহ) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তা তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তমের বিপরীত কাজ করার জন্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। নবুওয়তের উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে অনুত্তম কাজ করাও একটি ক্রটি যাকে কোরআনে শাসানোর ভঙ্গিতে ذنب তথা গোনাহ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। ماتقدم বলে নবুওয়তের পূর্ববর্তী ক্রটি এবং ماتأخر বলে নবুওয়ত লাভের পরবর্তী ক্রটি বোঝানো হয়েছে, - (মাযহারী)। প্রকাশ্য বিজয় এই ক্ষমার কারণ এজন্যে যে, এক প্রকাশ্য বিজয়ের ফলে দলে দলে লোক ইসলামে দাখিল হবে। ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপক আকার লাভ করা রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর জীবনের মহান লক্ষ্যকে সমন্নত করবে এবং তাঁর সওয়াব ও প্রতিদানকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, সওয়াব ও প্রতিদান বেড়ে যাওয়া ক্রটি মার্জনার কারণ হয়ে থাকে। - (বয়ানুল-কোরআন)

وَهَيْبَتِكَ مَرَكَاتٍ مِّنْهَا

এটা প্রকাশ্য বিজয়ের দ্বিতীয় কল্যাণ। এখানে প্রশ্ন হয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তো পূর্ব থেকেই 'সিরাতে-মুস্তাকীম' তথা সরল পথে ছিলেন এবং শুধু তিনিই নন বরং বিশুবাসীকে এই সরল পথের দাওয়াত দেয়াই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। অতএব, হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে প্রকাশ্য বিজয়ের মাধ্যমে সরল পথ পরিচালনা করার মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াব সূরা ফাতেহার তফসীরে হেদায়াত শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, হেদায়েত একটি ব্যাপক শব্দ। এর অসংখ্য স্তর আছে। কারণ, হেদায়েতের অর্থ অতীত মনবিলের পথ দেখানো অথবা সেখানে পৌঁছানো। প্রত্যেক মানুষের আসল অতীত মনবিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টির অসংখ্য ও অগণিত স্তর আছে। এক স্তর অর্জিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অর্জনের আবশ্যিকতা বাকী থাকে। কোন বৃহত্তম ওলী এমনকি নবী-রসূলও এই আবশ্যিকতা থেকে মুক্ত হতে পারেন না। এ কারণেই নামাযের প্রত্যেক রাকআতে **إِسْرَافًا لِّقِرَاطِ السُّبُورِ** বলে দোয়া করার শিক্ষা যেমন উম্মতকে দেয়া হয়েছে, তেমনই স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেও দেয়া হয়েছে। এর সারমর্ম হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়েত তথা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টির স্তরসমূহে উন্নতি লাভ করা। এই প্রকাশ্য বিজয়ের কারণে আল্লাহ তাআলা এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টিরই একটি অত্যুচ্চ স্তর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দান করেছেন, যাকে **هَيْبَتِكَ** শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَيُضَوِّرُكَ اللَّهُ تَوَارِثًا

এটা প্রকাশ্য বিজয়ের তৃতীয় নেয়ামত। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার যে সাহায্য ও সমর্থন আপনি চিরকাল লাভ করে এসেছেন, এই প্রকাশ্য বিজয়ের ফলস্বরূপ তা একটি মহান স্তর আপনাকে দান করা হয়েছে।

সূরার প্রথম তিন আয়াতে এই প্রকাশ্য বিজয়ের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রদত্ত বিশেষ নেয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। হুদায়বিয়ার সফর সঙ্গী কয়েকজন সাহাবী আরম্ভ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ! এসব নেয়ামত তো আপনার জন্যে। এগুলো আপনার জন্যে মোবারক হক, কিন্তু আমাদের জন্যে কি? এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে সরাসরি হুদায়বিয়ায় উপস্থিত সাহাবায়ে কেয়ামকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নেয়ামত যেহেতু ঈমান ও রসূলের (সাঃ) আনুগত্যের কারণ হয়েছে, তাই এগুলোতে সব মুমিনও शामिल। কারণ, যে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের পূর্ণতা লাভ করবে, সে-ই এসব নেয়ামতের যোগ্য পাত্র হবে।

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতকে বিশেষ করে বরাদ্দে রিযওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এসব নেয়ামত দানকারী ছিলেন আল্লাহ এবং দানের মাধ্যম ছিলেন রসূলুল্লাহ (সাঃ)। তাই এর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ ও রসূলের হক এবং তাঁদের প্রতি সম্মান ও সন্তম প্রদর্শনের কথা বলা হচ্ছে। প্রথমে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে তাঁর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে— **شَاهِدٌ، مَبِشْرٌ، نَذِيرٌ**

شَاهِدٌ শব্দের অর্থ সাক্ষী। এর উদ্দেশ্য তাই যা সূরা নেসার

كَيْفَ إِذَا جِئْتُمُوهُنَّ لَمَّا جُنَّوْنَ كُلِّ أُمَّةٍ يَشِئِبُ وَجْهَاتِكُمْ عَلَىٰ مَوَاسِيِدٍ

আয়াতের তফসীরে দ্বিতীয় ঋণে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি আল্লাহর পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছে

দিয়েছেন। এরপর কেউ আনুগত্য করেছে এবং কেউ নাফরমানী করেছে। এমনিভাবে নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন। সূরা নেসার আয়াতের তফসীরে কুরতুবী লিখেন : পয়গামরূপের এই সাক্ষ্য নিজ নিজ যমানার লোকদের সম্পর্কে হবে যে, তাঁদের দাওয়াত কে কবুল করেছে এবং কে বিরোধিতা করেছে। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাক্ষ্য তাঁর আমলের লোকদের সম্পর্কে হবে। কেউ কেউ বলেন, এই সাক্ষ্য সমস্ত উম্মতের পুণ্য ও পাপকাজ সম্পর্কে হবে। কেননা, কোন কোন রেওয়াজে থেকে জানা যায় যে, উম্মতের ক্রিয়াকর্ম সকল-সম্বাধ্য রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে পেশ করা হয়। কাজেই তিনি সমস্ত উম্মতের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে অবহিত হবেন।— (কুরতুবী)

بَشِيرٌ শব্দের অর্থ সুসংবাদদাতা এবং **نَذِيرٌ** শব্দের অর্থ সতর্ককারী। উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মতের আনুগত্যশীল মুমিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন এবং কাফের পাপাচারীদেরকে আধাবের ব্যাপারে সতর্ক করবেন। অতঃপর রসূল প্রেরণের লক্ষ্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। ঈমানের সাথে আরও তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা ঈমানদারদের মধ্যে থাকা বিষয়ে— **شَهِيدٌ، مَبِشْرٌ، نَذِيرٌ** এবং **نَذِيرٌ** শব্দটি **تَعْزِيرٌ** ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাহায্য করা। দণ্ডকেও এ কারণে **تَعْزِيرٌ** বলা হয় যে, অপরাধীকে দণ্ড দিলে প্রকৃতপক্ষে তাকে সাহায্য করা হয়।— (মুফরাদাতুল-কোরআন)

نَذِيرٌ শব্দটি **تَوْفِيرٌ** ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সম্মান করা। **شَهِيدٌ** শব্দটি **تَسْبِيحٌ** ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা করা। সর্বশেষ শব্দটি নিশ্চিতরূপে আল্লাহর জন্যেই হতে পারে। তাই এর সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বোঝানোর সম্ভাবনা নেই। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারাও আল্লাহকেই বুঝিয়েছেন। অর্থ এই যে, বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহকে অর্থাৎ, তাঁর দীনকে ও রসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর। কেউ কেউ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারা রসূলকে বুঝিয়ে এরূপ অর্থ করেন যে, রসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। কিন্তু কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, এতে সর্বনামসমূহের বিভিন্নতা জরুরী হয়ে পড়ে, যা অলংকার শাস্ত্রের নীতি বিরুদ্ধ। এরপর হুদায়বিয়ার ঘটনার দশম অংশে বর্ণিত বয়আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন : যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর হাতে বয়আত করেছে, তারা যেন স্বয়ং আল্লাহর হাতে বয়আত করেছে। কারণ, এই বয়আতের উদ্দেশ্য আল্লাহর আদেশ পালন করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। কাজেই তারা যখন রসূলের হাতে হাত রেখে বয়আত করল, তখন যেন আল্লাহর হাতেই বয়আত করল। আল্লাহর হাতের স্বরূপ কারও জানা নেই এবং জানার চেষ্টা করাও দূরস্ত নয়।

বয়আতের আসল অর্থ কোন বিশেষ কাজের জন্যে শপথ গ্রহণ করা। একজন অপরজনের হাতের উপর হাত রেখে শপথবানী উচ্চারণ করা বয়আতের প্রাচীন ও মছনূন তরিকা। তবে হাতের উপর হাত রাখা শর্ত বা জরুরী নয়। যে কাজের অস্বীকার করা হয়, তা পূর্ণ করা আইনভঙ্গ ওয়াজেব এবং রিকাজাচরণ করা হারাম। তাই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বয়আতের অস্বীকার ভঙ্গ করবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। এতে আল্লাহ ও রসূলের কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই অস্বীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।



(১০) যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে; অতি অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ সত্ত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন। (১১) মরুবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বসে রয়েছে, তারা আপনাকে বলবে : আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনদের কাছে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব, আমাদের পাপ মার্জনা করান। তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই। বলুন : আল্লাহ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে বিরত রাখতে পারে? বরং তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয় পরিপূর্ণ জ্ঞাত। (১২) বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রসূল ও মুমিনগণ তাদের বাড়ী-ঘরে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের জন্যে খুবই সুখকর ছিল। তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। (১৩) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব কাফেরের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। (১৪) নতামগল ও ভূমগলের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। (১৫) তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্যে যাবে, তখন যারা পক্ষান্তে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে : আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুন : তোমরা কখনও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ পূর্ব থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবে : বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। পরন্তু তারা সামান্যই বোকে।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লেখিত বিষয়বস্তু সেসব মরুবাসীর সাথে সম্পৃক্ত, যাদেরকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হোদায়বিয়ার সফরে সঙ্গে চলার আদেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা নানা তাল-বাহানার আশ্রয় নেয়। হোদায়বিয়ার ঘটনার প্রথম অংশ একথা বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়াজে থেকে জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে তওবা করে এবং খাটি ঈমানদার হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতসমূহে হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এসময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খয়বর যুদ্ধে গমন করার ইচ্ছা করলেন, তখন শুধু তাদেরকে সঙ্গে নিলেন, যারা হুদায়বিয়ার সফর ও বয়আতে-রিয়ওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল (সাঃ)-কে খয়বর বিজয় ও সেখানে প্রভূত গনীমতের মাল লাভের ওয়াদা দিয়েছিলেন। তখন যেসব মরুবাসী ইতিপূর্বে হুদায়বিয়ার সফরে আহূত হওয়া সত্ত্বেও ওয়র পেশ করে অংশগ্রহণে বিরত ছিল, তারাও খয়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করল; হয় এ কারণে যে, তারা লক্ষ্যাদি দৃষ্টে জানতে পেরেছিল যে, খয়বর বিজিত হবে এবং অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে। না হয় এ কারণে যে, মুসলমানদের সাথে আল্লাহর ব্যবহার ও হুদায়বিয়ার সন্ধির বিভিন্ন কল্যাণ দেখে জেহাদের অংশ গ্রহণ না করার কারণে তারা অনুতপ্ত হয়েছিল এবং এখন জেহাদে শরীক হওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল।

মোটকথা, তাদের জওয়াবে কোরআন বলেছে **يٰرِيْدُوْنَ اَنْ يُبَيِّنَ لُوَاكُمُ اللهُ** তারা আল্লাহর কালাম অর্থাৎ, তাঁর আদেশ পরিবর্তন করতে চায়। এই আদেশের অর্থ : খয়বর যুদ্ধ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিশেষ করে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্য। এরপর **كَذٰلِكَ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلِ** বাক্যেও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের এই বিশেষত্বের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাকের কোথাও এই বিশেষত্বের উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় এই বিশেষত্বের ওয়াদাকে 'আল্লাহর কালাম' ও "আল্লাহ বলে দিয়েছেন" বলা কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে?

ওহী শুধু কোরআনে সীমাবদ্ধ নয়, কোরআন ছাড়াও ওহীর মাধ্যমে আদেশ এসেছে এবং রসূলের হাদীসও আল্লাহর কালামের হুকুম রাখে : আলেমগণ বলেন : হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীর বিশেষত্ব সম্পর্কিত উল্লেখিত ওয়াদা কোরআন পাকের কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি; বরং এই বিশেষত্বের ওয়াদা আল্লাহ তাআলা "ওহী গায়র-মতলু" অর্থাৎ, অপঠিত ওহীর মাধ্যমে হুদায়বিয়ার সফরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দিয়েছিলেন। এ স্থলে একেই 'আল্লাহর কালাম' ও 'আল্লাহ ইতিপূর্বে বলে দিয়েছেন' বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, কোরআনের বিধানাবলী ছাড়া যেসব বিধান সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও এই আয়াত অনুযায়ী 'আল্লাহর কালাম' ও আল্লাহর উক্তির মধ্যে দাখিল। যেসব ধর্মভ্রষ্ট লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীসকে দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রমাণ বলেই স্বীকার করে না, এসব আয়াত তাদের ধর্মভ্রষ্টতা ফাঁস করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। এখানে আরও একটি আলোচনাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, হুদায়বিয়া সফরের শুরুতে অবতীর্ণ এই সূরার অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, **وَاِنَّكُمْ لَفِيْ سَكْرَةٍ** তফসীর-বিদগণের ঐকমত্যে এখানে "নিকটবর্তী বিজয়" বলে খয়বর বিজয়

قُلْ لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدَّةٌ عَوْنٌ إِلَى قَوْمِ أُولِي الْأَيْمَانِ
شَدِيدِي نُقَاتٍ وَأَوْثَقِيهِمْ وَأَوْثَقِيهِمْ وَأَوْثَقِيهِمْ وَأَوْثَقِيهِمْ وَأَوْثَقِيهِمْ
حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ①
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُرْصِينِ
حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْعُ إِلَيْهِ جُزْءًا مِمَّا فَضَّلْنَا لِمَنْ نَشَاءُ مِنْ قَوْمِ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ قَوْمِهِمْ يُؤْتُونَ مِنْ قَبْلِ عَذَابِ الْيَوْمِ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا بَرًّا وَمَغْنَمًا كَثِيرًا
يَأْخُذُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ② وَعَدَّ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ
كَثِيرًا تَأْخُذُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ③ وَكَفَّتْ أَيْدِي النَّاسِ
عَنْكُمْ وَلَتَكُونَنَّ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ④
وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ⑤ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا
الَّذِينَ بَرَأْنَا لَهُمْ دِينًا لِيَهْدِيكُمْ إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ تَحْدِثُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَتَّبِعُونَ ⑥

(১৬) গৃহে অবস্থানকারী মরুভূমির লোকেরা বলে দিন : আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহুত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। আর যদি পৃষ্ঠপোষকতা কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠপোষকতা করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। (১৭) অন্ধের জন্যে, খঞ্জের জন্যে ও রুগ্নের জন্যে কোন অপরাধ নাই এবং যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তাকে তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করবে, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। (১৮) আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (১৯) এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২০) আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্যে হ্রাসিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তম্ভ করে দিয়েছেন - যাতে এটা মুমিনদের জন্যে এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (২১) আরও একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ তা বেটন করে আছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (২২) যদি কাফেররা তোমাদের মোকাবিলা করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপোষকতা করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। (২৩) এটা আল্লাহর রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।

বোঝানো হয়েছে। এভাবে কোরআনে খয়বর বিজয় ও তার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হৃদয়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের পাওয়ার কথা এসে গেছে। এটাই “আল্লাহর কলাম” ও “আল্লাহর উক্তি” অর্থ হতে পারে। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, এই আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা তো আছে; কিন্তু একথা কোথাও বলা হয়নি যে, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হৃদয়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীরাই বিশেষভাবে পাবে, অন্যেরা পাবে না। এই বৈশিষ্ট্যের কথা নিঃসন্দেহে হাদীস দ্বারাই জানা গেছে। অতএব, “আল্লাহর কলাম” ও আল্লাহর উক্তি বলে এখানে হাদীসই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, “আল্লাহর কলাম” বলে সূরা তওবার এই আয়াতকে বোঝানো হয়েছে:

فَأَسْتَأْذِنُكَ لِلْخُرُوبِ فَقُلْ كُنْ مَعَهُمْ وَأَمْرِي أَمْرًا وَإِنْ تَقَاتَلُوا

عَدَاؤُكُمْ رَضِيئًا الْقَوْمِ أَوْلَىٰ مَرَّةً

তাদের এই উক্তি শুদ্ধ নয়। কারণ, এই আয়াতগুলো তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যার সময়কাল খয়বর যুদ্ধের পর নবম হিজরী — (কুরতুবী)

এতে হৃদয়বিয়া থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের— কে তাকীদ সহকারে বলা হয়েছে; তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। এই উক্তি বিশেষভাবে খয়বর যুদ্ধের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। ভবিষ্যতে অন্য কোন জেহাদেও শরীক হতে পারবে না— আয়াত থেকে এটা মনে করা জরুরী নয়। এ কারণেই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্য থেকে মুযায়না ও জোহায়না গোত্রদ্বয় পরবর্তীকালে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। — (জাহুল-মা’আনী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হৃদয়বিয়ার সফর থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কেউ কেউ পরে তওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল; হৃদয়বিয়ার সফর থেকে যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল, তাদের সবাইকে খয়বরের জেহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল অথচ তাদের মধ্যে সবাই মুনাফিক ছিল না। কেউ কেউ মুসলমানও ছিল। কেউ কেউ যদিও তখন মুনাফিক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা সাক্ষা ঈমানদার হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। তাই এ ধরনের লোকদের সন্তুষ্টির জন্যে পরবর্তী আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী খয়বর যুদ্ধ হৃদয়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যারা খাঁটি মুসলমান এবং মনে-প্রাণে জেহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যেও ভবিষ্যতে আরও সুযোগ-সুবিধা আসবে। এসব সুযোগের কথা কোরআন পাক একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে বর্ণনা করেছে, যা রসূল করীম (সাঃ)—এর ইস্তিকালের পর প্রকাশ পেয়েছে। এরশাদ হয়েছে : سُدَّةٌ عَوْنٌ

অর্থাৎ, এক সময় আসবে, যখন তোমাদের— কে জেহাদের দাওয়াত দেয়া হবে। এই জেহাদ একটি শক্তিশালী যোদ্ধাজাতির সাথে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই জেহাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়নি। কেননা, প্রথমতঃ এরপর তিনি কোন যুদ্ধে মরুভূমির লোকের দাওয়াত দিয়েছেন বলে প্রমাণ নেই; দ্বিতীয়তঃ এরপর এমন কোন বীর যোদ্ধা জাতির সাথে মোকাবেলাও হয়নি, যাদের

খয়বর বিজয় : খয়বর প্রকৃতপক্ষে বহু জনপদ দুর্গ ও বাগ-বাগিচা সমন্বিত একটি বিশেষ এলাকার নাম। — (মাযহারী)

وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِئْسَ الْفِتْنَىٰ وَهُوَ كَثِيرٌ وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِئْسَ الْفِتْنَىٰ وَهُوَ كَثِيرٌ এই আসন্ন বিজয়ের অর্থ সর্বসম্মতভাবে খয়বর বিজয়। হৃদয়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এই বিজয় বাস্তবরূপ লাভ করে। এক রেওয়াজেত অনুযায়ী হৃদয়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় দশ দিন এবং অন্য এক রেওয়াজেত অনুযায়ী বিশ দিন অবস্থান করেন। এরপর খয়বরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান। ইবনে ইসহাকের রেওয়াজেত অনুযায়ী তিনি যিলহজ্জ মাসে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সপ্তম হিজরীর মাহররম মাসে খয়বর গমন করেন। সফর মাসে খয়বর বিজিত হয়। ওয়াবেদীর মাগাযী অধ্যায়ে তাই বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজারের মতে এ অভিমতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। — (মাযহারী)

মোটকথা, প্রমাণিত হল যে, খয়বর বিজয়ের ঘটনা হৃদয়বিয়ার সফরের বেশ কিছুদিন পরে সংঘটিত হয়। সূরা ফাতহ্ যে হৃদয়বিয়ার সফরকালে অবতীর্ণ হয়েছে এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। হাঁ, এ বিষয়ের মতভেদ রয়েছে যে, সম্পূর্ণ সূরা তখনই নাথিল হয়েছিল, না কিছুসংখ্যক আয়াত পরে নাথিল হয়েছে। প্রথমোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহে খয়বরের আলোচনা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে হয়েছে এবং ঘটনাটি যে আকাট্য ও নিশ্চিত – একথা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে শেষোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ পরে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

وَمَعَاذَ اللَّهِ لَكُنَّ لَهُمْ عِتَابًا وَمَعَاذَ اللَّهِ لَكُنَّ لَهُمْ عِتَابًا এতে খয়বরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বোঝানো হয়েছে, যুদ্ধারা মুসলমানদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হয়।

وَعَدَاكَ اللَّهُ مَعَآذِرَ كَثِيرَةً تَأْخُذُ وَهِيَ كَأَنَّهَا كَلْبٌ يُكَفِّرُ بَعْدَ إِسْمِهِ؟ — এখানে কেয়ামত পর্যন্ত যেসব ইসলামী বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে,

সেগুলো বোঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত সম্পদ আল্লাহ্র নির্দেশে হৃদয়বিয়ায় অশেগ্রহণকারীদের জন্যে দেয়া হয়েছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত সম্পদ সবার জন্যে ব্যাপক। এ থেকেই জানা যায় যে, বিশেষত্বের আদেশ এসব আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি; বরং তা পৃথক ওহীর মাধ্যমে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলে দেয়া হয়েছিল। তিনি তা কর্মে পরিণত করেন এবং সাহাবায়ে কেরামের কাছে ব্যক্ত করেন।

وَكُنْتُمْ أَكْثَرُ الْأُمَّةِ عِنْدَ اللَّهِ وَأَكْثَرُ الْأُمَّةِ عِنْدَ اللَّهِ আয়াতে খয়বরবাসী কাকের সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই জেহাদে অধিক শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দেননি। ইমাম বগতী বলেন : গাতফান গোত্র খয়বরের ইহুদীদের মিত্র ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক খয়বর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তারা ইহুদীদের সাহায্যার্থে অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত হয়ে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে তীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা চিন্তা করতে লাগল, যদি আমরা খয়বরে চলে যাই, তবে মুসলমানদের কোন লশকর আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের বাড়ী-ঘরে চড়াও হতে পারে। এই ভেবে তাদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। — (মাযহারী)

وَيُهِدِيكُمْ سُبُلَكُمْ وَتَأْتِيكُمْ سُبُلَكُمْ وَتَأْتِيكُمْ سُبُلَكُمْ সরল পথের আমল এবং হেদায়েত তো তাঁদের পূর্বে থেকেই অর্জিত ছিল। কিন্তু পূর্বেও বলা হয়েছে যে, হেদায়েতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এখানে সেই স্তর বোঝানো হয়েছে, যা অর্জিত ছিল না। অর্থাৎ, আল্লাহ্র উপর একান্ত নির্ভরশীলতা এবং ঈমানী শক্তির বৃদ্ধি।

وَالْغُرَىٰ لَكُنَّ لَهُمْ عِتَابًا عَلَيْهِمْ أَتَدْرَأُ اللَّهُ بِهَا মুসলমানদেরকে আরও অনেক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এখনও তাদের ক্ষমতাসীন নয়। এসব বিজয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কা বিজয় রয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতে মক্কা বিজয়কেই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাষা ব্যাপক হেতু কেয়ামত পর্যন্ত আগত সব বিজয়ই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ
 مِنْ بَعْدِ أَنْ أظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٥﴾
 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْبَدْ وَكُمُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ
 مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حَيْلَهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَآمَنَ مَوَدَّتُهُمْ
 لَمْ تَعْلَمُوا هُمْ أَنْ تُطْرَهُمْ فَأُنزِلَتْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ يُغَيِّرُ عَلَيْهِمْ
 لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَرَى الَّذِينَ أُذِنَ لَهُمْ أَنْ
 كَفَرُوا وَأَمَنُوا عَدَايَا أَلِيمًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي
 قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
 عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُ كَلِمَةً التَّوْحِيدِ وَ
 كَانُوا أَحْسَنَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٧﴾
 لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّبُوبِيَا الْحَقَّ كَلِمَةً تَلَدَّ حُنُقِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ لِلَّذِينَ احْتَمَوْنَهُمْ وَمُقَدَّرِينَ
 لَا تَخَافُونَ تَعْلَمُونَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَفَجَعَلْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فِتْنًا
 وَرَبِّمَا ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٩﴾

(২৪) তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারণ করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন। (২৫) তারাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে এবং অবস্থানরত কোরবানীর জন্তুদেরকে যথাস্থানে পৌঁছতে। যদি মক্কায় কিছুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না। অর্থাৎ, তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সব কিছু চুকিয়ে দেয়া হত; কিন্তু এ কারণে চুকানো হয়নি, যাতে আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেন। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে যত্নাদায়ক শাস্তি দিতাম। (২৬) কেননা, কাফেররা তাদের অন্তরে মুর্খতায়ুগের জেদ পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাখিল করলেন এবং তাদের জন্যে সংযমের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিলেন। বস্ত্রতঃ তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (২৭) আল্লাহ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুগ্ধিত অবস্থায় এবং কেশ কতিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয় (২৮) তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ যথেষ্ট।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بَطْنِ مَكَّةَ এর আসল অর্থ মক্কা শহরই; কিন্তু এখানে হৃদয়বিয়ার স্থান বোঝানো হয়েছে। মক্কার সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ার কারণে হৃদয়বিয়াকেই “বাতনে মক্কা” বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ হৃদয়বিয়ার কিছু অংশকে হরমের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই আয়াত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। أَنْ يَبْلُغَ حَيْلَهُ এ থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি এহরাম বাধার পর মক্কা প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কোরবানী করে এহরাম থেকে হালাল হওয়া তার পক্ষে অপরিহার্য। এতে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, এই কোরবানী বাধাপ্রাপ্তির স্থানেই হতে পারে, না অন্যন্য কোরবানীর ন্যায় এর জন্যেও হরমের অভ্যন্তরে হওয়া শর্ত? হানাফীদের মতে এর জন্যে হরমের সীমানা শর্ত। আলোচ্য আয়াত তাদের প্রমাণ। এখানে এই কোরবানীর জন্যে কোরআন একটি বিশেষ স্থান সাব্যস্ত করেছে, যেখানে পৌঁছতে কাফেররা মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছিল। এখানে কথা থাকে যে, খোদা হানাফী আলেমগণ একথাও বলেন যে, হৃদয়বিয়ার কতক অংশ হরমের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় হরমে প্রবেশে বাধাদান কিরূপে প্রমাণিত হয়? জ্ঞপ্তাব এই যে, যদিও এই কোরবানী হরমের যে কোন অংশে করে দেয়া যথেষ্ট; কিন্তু মীনার অভ্যন্তরে “মানহার” (কোরবানাগাহ) নামে যে বিশেষ স্থান রয়েছে, সেখানে কোরবানী করা উত্তম। কাফেররা তখন মুসলমানদেরকে এই উত্তম স্থানে জন্তু নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল।

مَعْرَةٌ - শব্দের অর্থ কেউ কেউ

গোনাহ বর্ণনা করেছেন, কেউ সাধারণ ক্ষতি এবং কেউ দোষ বর্ণনা করেছেন। এ স্থলে শেষোক্ত অর্থই বাহ্যতঃ সঙ্গত। কারণ, যদি মুছ শুরূ হয়ে যেত এবং অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের হাতে মক্কায় আটক মুসলমানগণ নিহত হত, তবে এটা একটা দোষ ও লজ্জাকর ব্যাপার হত। কাফেররা মুসলমানদেরকে লজ্জা দিত যে, তোমরা তোমাদের দ্বীনি ভাইদেরকে হত্যা করেছ। এছাড়া এটা ক্ষতিকর ব্যাপারও ছিল। নিহত মুসলমানদের ক্ষতি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। হত্যাকারী মুসলমানগণও অনুতাপ ও আক্ষেপের অনলে দগ্ধ হত।

সাহাবায়ে কেলামকে দোষত্রুটি থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থাঃ ইমাম কুরতুবী বলেনঃ অজ্ঞাতসারে এক মুসলমানের হাতে অন্য মুসলমান মারা যাওয়া গোনাহ তো নয়; কিন্তু দোষ, লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপের কারণ অবশ্যই, ভুলবশতঃ হত্যার কারণে রক্তপণ ইত্যাদি দেয়ারও বিধান আছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলের (সাঃ) সাহাবীদেরকে এ থেকেও নিরাপদ রেখেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেলাম যদিও পয়গম্বরগণের ন্যায় নিষ্পাপ নন, কিন্তু সাধারণভাবে তাঁদেরকে ভুলভ্রান্তি ও দোষ থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হয়ে যায়। এটাই তাঁদের সাথে আল্লাহর ব্যবহার।

لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এই

ক্ষেত্রে মুসলমানদের অন্তরে সংযম সৃষ্টি করে মুছ না হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ, আল্লাহ জানতেন যে, ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। তাদের প্রতি এবং মক্কায় আটক মুসলমানদের প্রতি রহমত করার জন্যে এসব আয়োজন করা হয়েছে।

لَوْ تَزَيَّلُوا - শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মক্কায় আটক মুসলমানগণ যদি কাফেরদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হত এবং মুসলমানগণ তাদেরকে চিনে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিতে পারত, তবে এই মুহূর্তেই কাফেরদেরকে মুসলমানদের হাতে শাস্তি প্রদান করা হত। কিন্তু মুশাকিল এই যে, আটক দুর্বল মুসলমান পুরুষ ও নারী কাফেরদের মধ্যেই মিশ্রিত ছিল। যুদ্ধ হলে তাদেরকে বাঁচানোর উপায় ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা যুদ্ধই মওকুফ করে দিলেন।

“কলেমায়ে- وَالرِّمَّةُ كَلِمَةُ الشُّعْرِى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا

তাকওয়া” বলে তাকওয়া অবলম্বনকারী কলেমা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তওহীদ ও রেসালতের কলেমা। এই কলেমাই তাকওয়ার ভিত্তি। তাই একে কলেমায়ে-তাকওয়া বলা হয়েছে। সাহাবায়ে কেলামকে এই কলেমার অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত আখ্যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা সেসব লোকের লাঞ্ছনা প্রকাশ করে দিয়েছেন, যারা তাঁদের প্রতি কুফর ও নিফাকের দোষ আরোপ করে। আল্লাহ তো তাঁদেরকে কলেমায়ে ইসলামের অধিক যোগ্য বলেন, আর এই হতভাগারা তাঁদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে।

হৃদয়বিয়ার সন্ধি চূড়ান্ত হয়ে গেলে একথা স্থির হয়ে যায় যে, এখন মক্কায় প্রবেশ এবং ওমরা পালন ব্যতিরেকেই মদীনায় ফিরে যেতে হবে। বলাবাহুল্য, সাহাবায়ে কেলাম ওমরা পালনের সংকল্প রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে করেছিলেন, যা এক প্রকার ওহী ছিল। এখন বাহ্যতঃ এর বিপরীত হতে দেখে কারও কারও অন্তরে এই সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল যে, (নাউযুবিল্লাহ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর স্বপ্ন সত্য হল না। অপরদিকে কাফের-মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে বিদ্রূপ করল যে, তোমাদের রসূলের স্বপ্ন সত্য নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ آয়াতটি অবতীর্ণ হয়। — (বায়হাকী)

كَذِبَ شَرِكِ - لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّبِّيَّ بِالْحَقِّ

এর বিপরীতে কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়। যে কথা বাস্তবের অনুরূপ, তাকে صدق এবং যে কথা অনুরূপ নয়, তাকে كَذِب বলা হয়। মাঝে মাঝে কাজকর্মের জন্যেও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। তখন এর অর্থ হয় কোন কাজকে বাস্তবায়িত করা; যেমন কোরআনে আছে — رَجَاءَ صَدَقَاتِهِمْ آয়াতটিতে, অর্থাৎ, তারা তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে।

এ সময় صدق শব্দের দু'টি مفعول থাকে; যেমন আলোচ্য আয়াতে প্রথম مفعول হচ্ছে رسوله এবং দ্বিতীয় مفعول হচ্ছে رؤيا আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাঁর রসূলের স্বপ্নের ব্যাপারে সাক্ষা দেখিয়েছেন। — (বায়হাকী) যদিও এই সাক্ষা দেখানোর ঘটনা ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার ছিল; কিন্তু একে অতীত পদ বাচ্য ব্যক্ত করে এর নিশ্চিত ও অকাট্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেমতে পরবর্তী বাক্যে ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে — لَتَذُخُنَّ النَّسِجَةَ السَّوَامَةَ অর্থাৎ, মসজিদে-হারামে প্রবেশ সংক্রান্ত আপনার স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এ বছর নয়— এ বছরের পরে। স্বপ্নে মসজিদে-হারামে প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট ছিল না। পরম ঔৎসুক্যবশতঃ সাহাবায়ে কেলাম এ বছরই সফরের সংকল্প করে ফেললেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। এতে আল্লাহ তাআলার বিরাট রহস্য নিহিত ছিল, যা হৃদয়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। সেমতে হিন্দিকে আকবর (রাঃ) প্রথমই হযরত ওমর (রাঃ)-এর জগুয়াবে বলেছিলেনঃ আপনার সন্দেহ

করা উচিত নয়, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বপ্ন কোন সময় ও বছর নির্দিষ্ট ছিল না। এখন না হলে পরে হবে। — (কুরতুবী)

ভবিষ্যৎ কাজের জন্য “ইনশাআল্লাহ” বলার তাকীদঃ এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মসজিদে-হারামে প্রবেশের সাথে যা ভবিষ্যতে হওয়ার ছিল— “ইনশাআল্লাহ” শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ আল্লাহ নিজের চাওয়া সম্পর্কে নিজেই জ্ঞাত। তাঁর এরূপ বলার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু স্বীয় রসূল ও বলাদেদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে এখানে আল্লাহ তাআলাও “ইনশাআল্লাহ” শব্দ ব্যবহার করেছেন। — (কুরতুবী)

سَهِيْهُ بَوَاخِرِيْتِهٖ اَحَدِهٖ ۙ وَرَسُولُهُ وَمَقْصُرِيْنِ

কাযা ওমরায় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র কেশ কাঁচি দ্বারা কতন করেছিলেন। এটা কাযা ওমরারই ঘটনা। কেননা, বিদায় হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মস্তক মুণ্ডিত করেছিলেন। — (কুরতুবী)

فَقَوْلُ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا অর্থাৎ, এ বছরই তোমাদেরকে মসজিদে-হারামে

প্রবেশ এবং ওমরাহ করিয়ে দিতে আল্লাহ তাআলা সক্ষম ছিলেন। পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করার মধ্যে বড় বড় রহস্য নিহিত ছিল, যা আল্লাহ জানতেন— তোমরা জানতে না। তন্মধ্যে এক রহস্য এটাও ছিল যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছিল খয়বর বিজিত হয়ে মুসলমানদের শক্তি ও সাজ-সরঞ্জাম বর্ধিত হোক এবং তারা পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি সহকারে ওমরা পালন করুক। এ কারণেই বলা হয়েছেঃ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ

فَقَوْلُ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا অর্থাৎ, স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করার আগে খয়বরের আসন্ন

বিজয় মুসলমানগণ লাভ করুক। কেউ কেউ বলেন এই আসন্ন বিজয় বলে খোদ হৃদয়বিয়ার সন্ধি বোঝানো হয়েছে। কারণ, এটা মক্কা বিজয় ও অন্যান্য সব বিজয়ের ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে সকল সাহাবীই একে বৃহত্তম বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ বছর তোমাদের সফরের সংকল্প করার পর ওমরা পালনে ব্যর্থতা ও সন্ধি সম্পাদনের মধ্যে যেসব রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা তোমাদের জানা ছিল না কিন্তু আল্লাহ তাআলা সব জানতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, এই স্বপ্নের ঘটনার আগে হৃদয়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তোমাদেরকে একটা আসন্ন বিজয় দান করবেন। এই আসন্ন বিজয়ের ফলাফল সবাই প্রত্যক্ষ করেছে যে, হৃদয়বিয়ার সফরে মুসলমানদের সংখ্যা দেড় হাজারের বেশী ছিল না। সন্ধির পর তাদের সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত হয়ে গেল। — (কুরতুবী)

هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ

বিজয়, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা এবং বিশেষভাবে হৃদয়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবী ও সাধারণভাবে সকল সাহাবীর গুণাবলী ও সুসংবাদ উল্লেখিত হয়েছে। এখন সূরার উপসংহারে সেসব বিষয়বস্তুর সারমর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে। এসব নেয়ামত ও সুসংবাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনুগত্য ও সত্যায়নের কারণেই প্রদত্ত হয়েছে। তাই এই সত্যায়ন ও আনুগত্যের উপর জোর দেয়ার জন্যে, রেসালত অধীকারকারীদের যুক্তি খণ্ডন করার লক্ষ্যে এবং হৃদয়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের অন্তরে যেসব সন্দেহ পূঞ্জীভূত হয়েছিল, সেগুলো দূরীকরণের জন্যে আলোচ্য আয়াতসমূহে রেসালত সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং জগতের সব ধর্মের উপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর দ্বীনকে জয়যুক্ত করার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।